আমার দেশ

রোববার ৩১ আগস্ট ২০০৮, ১৬ ভাদ্র ১৪১৫

বাল্যবিয়ে : প্রতিরোধে করণীয়

ইয়াসমীন আরা লেখা

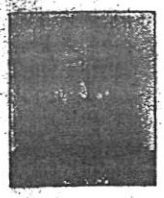

একটি দেশকে উন্নয়নের পথে ধাবিত করার জন্য যেসব শর্তের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা ও সচেতনতা। শিক্ষা ও সচেতনতাই মানুষকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার থেকে দূরে সরিয়ে সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেয়। এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অভাবজনিত কারণে সমাজে যেসব ভয়াবহ ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো বাল্যবিয়ে। বাল্যবিয়ের সুদূরপ্রসারী ফল অত্যন্ত ভয়াবহ।

আইনগতভাবে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ ও ছেলেদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ২১। এ বয়স নির্ধারণের পেছনে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। এ বয়সের আগ পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ের প্রজনন ক্ষমতা পরিণত ও পরিপক্ব হয় না। ফলে এ বয়সের আগে কোনো দম্পতি যদি বৈবাহিক জীবন শুরু করে এবং সন্তানের জন্ম দেয় তবে সেই সন্তান বিভিন্ন দিক থেকে অপরিণত ও অপরিপক্ব হয়ে জন্ম নেয়। অনেক সময় তারা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে পরিবার ও সমাজের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের হার খুবই বেশি। এর কারণ খুঁজতে গেলে বহুদিক বেরিয়ে আসে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন শিক্ষিত সমাজেও বাল্যবিয়ে সংগঠিত হতো। হিন্দু সমাজে বাল্যবিয়েকে ধর্মীয় আঙ্গিক থেকে দেখা হতো। সে সময় 'গৌরীদান' প্রথা অর্থাৎ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিয়ে দেয়া পুণ্যের কাজ বলে বিশ্বাস করা হতো। তখনকার মুসলিম সমাজের চিন্তা ছিল মেয়েরা সাবালিকা হলে যত তাড়াতাড়ি তাদের পাত্রস্থ করা যায় ততই মঙ্গল। এ সময় বাল্যবিবাহের অশুভ প্রভাব নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেগম রোকেয়া তাদের প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ করে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। ১৯২৯ সালে এতদসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন হয়। এ আইনে বিয়ে সম্পন্নকারী অভিভাবকদের এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় প্রকার শাস্তির বিধান রাখা হয়। এই যৎসামান্য আইন দিয়ে বাল্যবিয়ে প্রাচীনকালেও প্রতিরোধ করা যায়নি এবং এখনো এর কালো থাবা আমাদের সমাজকে মাঝে মধ্যে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে বাল্যবিয়ে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সিংহভাগ জনসংখ্যা অধ্যুষিত গ্রামবাংলায় বাল্যবিবাহ চলছে। মেয়েরা এর শিকার বেশি হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইনের অপ্রতুলতা, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এর প্রধান কারণ। এ কারণগুলো একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত। আমরা জানি, গ্রাম এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এখানে দারিদ্র্যতাও প্রকট। একটি পরিবারে যখন অধিক সন্তানের জন্ম হয় স্বাভাবিকভাবেই পিতা-মাতা সন্তানদের ভরণপোষণে সমস্যায় পড়েন। এছাড়া এসব পরিবারে ছেলেসন্তানদের সংসারের হাল ধরার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং মেয়েদের বোঝা হিসেবে ধরা হয়। তাই পিতাদের চেষ্টা কত দ্রুত মেয়েকে পাত্রস্থ করে বোঝামুক্ত হওয়া যায়। শিক্ষার অভাবে এসব বাবা-মায়েরা বোঝেন না যে, এ ধরনের বিয়ের পরিণতি ইতিবাচক হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা আবার সন্তানসহ বাবার সংসারে ফিরে এসে দ্বিগুণ বোঝা হিসেবে চেপে বসে। বাল্যবিয়ের পরিণতি শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক--সব ক্ষেত্রেই নেতিবাচক ফল বয়ে আনে। ইউনিসেফের এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৯২ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সের আগে। মোটামুটিভাবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ ধারা থাকলেও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের বয়স আরো নিচে। জীবন পরিক্রমার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সের সময়কাল হলো বয়ঃসন্ধিকাল অর্থাৎ এ সময় শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একজন কিশোর বা কিশোরী পুরুষসুলভ ও নারীসুলভ শারীরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। জীবন পরিক্রমায় তার এই যে বিশেষ শারীরিক পরিবর্তন সূচিত হয় তার সঙ্গে মনোজগতের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যও তাকে ন্যূনতম কিছু সময় দিতে হয়। তাই ১৮ বছর বিয়ের বয়স হিসেবে স্বীকৃত থাকলেও ২০-এর আগে সন্তান জন্মদান বা মা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এছাড়া দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তানরা অপুষ্টিকে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠে। শিক্ষার অভাবে তারা নিজেদের মধ্যে সচেতনতার বীজ বপন করতে পারে না।

বাল্যবিয়ের পরিণতি শুধু শিশু, অল্পবয়সী মেয়ে বা তার পরিবার ভোগ করে না বরং এর পরিণতি হিসাবে দেশ হয় অপুষ্টি ও দুর্বল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তরাধিকারী। দেশের উন্নয়নের জন্য যেখানে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সেখানে বাল্যবিয়ে ও এর পরিণতি সংক্রান্ত বিষয়ে নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো সচেতন নাগরিকের কাম্য হতে পারে না।

তাই বাবা-মায়ের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াকেই তারা কর্তব্য মনে করে। এসব অপরিণত বয়সের মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক পরিণতি লাভের আগেই সন্তান গর্ভে ধারণ করে। এর ফলে অনেক সময় মা ও সন্তান উভয়েরই জীবন ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। কিশোরী মা ও তাদের সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হার বেশি। এছাড়া এসব মা যে সন্তান জন্ম দেয় তারা অপুষ্টি ও বিভিন্ন শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যে কিশোরী নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারেনি, অল্প বয়সে মা হয়ে সে সন্তানের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। যথাযথ যত্নের অভাবে অপুষ্টি দুর্বল শিশুর বিকাশ জন্মের পরও বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাল্যবিবাহের সুদূরপ্রসারী ভয়াবহতা হিসেবে পরবর্তী প্রজন্ম দুর্বল ও মেধাহীন হিসেবে বেড়ে ওঠে।

যেসব মেয়ে বাল্যবিয়ের শিকার হয় তাদের সঙ্গে স্বামীর বয়সের পার্থক্য বেশি থাকে। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় অপরিণত বয়সে অধিক সন্তানের জন্ম দেয়। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভূমিকায় যথাযথভাবে অবতীর্ণ হতে না পারায় স্বামীরা স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বহুবিবাহে অভ্যস্ত হয়ে স্ত্রী-সন্তান পরিত্যাগ করে। পরিত্যক্ত স্ত্রী-সন্তান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাবা-ভাইয়ের সংসারে ফিরে আসে। অর্থাৎ নির্যাতন-যন্ত্রণা এসব মেয়েদের নিত্যসাথী হয়ে দাঁড়ায়। তাদের জীবন তো নিঃশেষিত হয়ই, উপরন্তু তাদের যে সন্তান থাকে এবং ওই সন্তানের মধ্যে যদি মেয়ে সন্তান থাকে এরা একই শৃঙ্খলে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ শৃঙ্খল থেকে যেন তাদের মুক্তি নেই।

বাল্যবিয়ে প্রথম শিকার হয় শিশু, দ্বিতীয় শিকার হয় নারী এবং তৃতীয় শিকার হয় সমাজ। এর সুদূরপ্রসারী ফল প্রকারান্তরে পুরো জাতির ওপর গিয়ে পড়ে। তাই এ অশুভ পরিণতি থেকে গোটা জাতিকে মুক্ত করার জন্য আমাদের তৎপর হতে হবে। শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই মূলত এখান থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জন্মনিবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এর দ্বারা বিয়ের বৈধ বয়স প্রমাণ করা যাবে, তাই জন্মনিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করে বিয়ের সময় জন্ম সনদ উপস্থাপনকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। রেজিস্ট্রি অফিস দ্বারা প্রতি বছর অডিটের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বিয়ের সময় বয়স বাড়িয়ে দেয়ার সুযোগ না পায়। একই সঙ্গে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সব বিয়ের রেজিস্ট্রেশন হয় না। বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বয়সের শর্তারোপ তথা জন্ম সনদ বাধ্যতামূলক করা হলে এ ব্যাধি ক্রমেই নির্মূল হবে। এ ব্যাপারে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যায় প্রায় অর্ধেক নারী। এ নারী সমাজ শিক্ষা সচেতনতা সবদিক থেকেই পিছিয়ে আছে বিধায় বিভিন্ন কুসংস্কারের বলি হচ্ছে। বাল্যবিবাহও এই অজ্ঞতা ও অন্ধকারের ভয়াবহ পরিণতি। তাই শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই এ ভয়াবহ ব্যাধির শেকড় নির্মূল করতে হবে। ইতোমধ্যে এর কিছু সুফল লক্ষ্য করা গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, স্কুলপড়ুয়া মেয়েরা তাদের শিক্ষক, সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করছে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে আশার আলোকবর্তিকা। একই সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করে দ্রুততম সময়ে উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। বাল্যবিয়ে সহায়তাদানকারী অভিভাবকদের শাস্তি ও আর্থিক দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। উপজেলা পদ্ধতিসহ স্থানীয় সরকার পদ্ধতিকে অধিক হারে সক্রিয় করে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দেশের আলেম সমাজ ও স্কুল শিক্ষকদেরও ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে পরিবার পরিকল্পনাকর্মীদের কাজে লাগানো গেলে একই সঙ্গে সরকার দেশের দু'টি উল্লেখযোগ্য সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এনজিও, মিডিয়া, সুশীল সমাজের অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এ ব্যাপারে সরকারের কর্মকাণ্ডকে সহযোগিতা দিতে হবে। উল্লিখিত সব বিষয়ে যদি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় তবে নিকট ভবিষ্যতে হতো আমরা এ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো।

বাল্যবিয়ের পরিণতি শুধু শিশু, অল্পবয়সী মেয়ে বা তার পরিবার ভোগ করে না বরং এর পরিণতি হিসাবে দেশ হয় অপুষ্টি ও দুর্বল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তরাধিকারী। দেশের উন্নয়নের জন্য যেখানে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সেখানে বাল্যবিয়ে ও এর পরিণতি সংক্রান্ত বিষয়ে নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো সচেতন নাগরিকের কাম্য হতে পারে না। এটিকে নারী ইস্যু না ভেবে জাতিগত ইস্যু হিসাবে শনাক্ত করে এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে সময়ক্ষেপণ করা কোনো মতেই উচিত হবে না।

লেখক : ডিন, স্কুল অব এডুকেশন অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা